২০১৪ টিআইপি প্রতিবেদন

বাংলাদেশ – দ্বিতীয় পর্যায়

প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ বাধ্যতামূলক শ্রম ও দেহব্যবসার জন্য পাচারকৃত নারী, পুরুষ ও শিশুর জন্য একটি উৎস রাষ্ট্র এবং কিছুটা ছোট পরিসরে হলেও একই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ গন্তব্য রাষ্ট্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। কিছু বাংলাদেশী নারী ও পুরুষ, যারা স্বেচ্ছায় পারস্য উপসাগরীয় রাষ্ট্র, ইরাক, ইরান, লেবানন, মালদ্বীপ, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ব্রুনেই, সুদান, মরিশাস, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে কাজ করতে যায় তারা এমন কিছু পরিস্থিতির শিকার হয় যা বাধ্যতামূলক শ্রমের নির্দেশক। বিদেশে কাজ করতে যাওয়ার আগে অনেক অভিবাসী শ্রমিকই উচ্চ নিয়োগ ফি প্রদান করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। এই উচ্চ নিয়োগ ফি বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নিয়োগ সংস্থা সংগঠন (বায়রা) দ্বারা আইনসম্মতভাবে কিংবা লাইসেন্সবিহীন সাব-এজেন্ট কর্তৃক বেআইনীভাবে আরোপিত হয়। যার ফলে কিছু অভিবাসী শ্রমিকদেরকে এমন পরিস্থিতিতে পড়তে হয় যা ঋণশোষন হিসেবে অভিহিত করা যায়। কিছু নিয়োগ সংস্থা ও নিয়োগকারী এজেন্টরা বিভিন্ন নিয়োগ সংক্রান্ত জালিয়াতিও করে থাকে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে চুক্তি পরিবর্তন যেখানে তারা একধরনের কাজের ও শর্তের কথা বলে প্রতিশ্রুতি দেয় কিন্তু পরবর্তীতে কর্মস্থলে পৌঁছানোর পর চাকুরী, নিয়োগকর্তা, চাকুরীর শর্ত ও বেতন ইত্যাদি সব কিছু পরিবর্তন করে দেয়। বাংলাদেশ থেকে কিছু নারী ও শিশু ভারত ও পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে তারা বাণিজ্যিক যৌন অপব্যবহার অথবা বাধ্যতামূলক শ্রমের শিকার হয়। বাংলাদেশে বিশেষ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মানবপাচারের শিকার হয়ে থাকে।

দেশের মধ্যেও কিছু বাংলাদেশী শিশু ও প্রাপ্তবয়স্করা যৌন কাজে ব্যবহারের জন্য পাচারের শিকার হয়। এদের মধ্যে গ্রামীণ এলাকায় প্রধানত শিশু ও প্রাপ্তবয়স্করা গৃহদাসত্ব এবং বাধ্যতামূলক ও দাসশ্রমের শিকার হয়। এক্ষেত্রে পাচারকারী বা নিয়োগকারী সংস্থা কর্মসংস্থানের চুক্তির অংশ হিসেবে একজন কর্মী কর্তৃক নেয়া ঋণের অপব্যবহার করে। কিছু রাস্তার শিশু বা টোকাইদের অপরাধে লিপ্ত হতে বা ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য করা হয়; ভিক্ষাবৃত্তির হোতাগণ মাঝে মাঝে শিশুদের বিকলাঙ্গ করে দেয় যাতে করে তারা ভিক্ষাদাতাদের সহানুভূতি আদায় করতে পারে এবং আরো অধিক অর্থ উপার্জন করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পিতামাতারা দাসশ্রমের জন্য তাদের সন্তানদের বিক্রি করে দেয় আবার অন্যান্য ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুরা জালিয়াতি ও শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক শ্রম বা যৌন অপব্যবহারের শিকার হয়। এই সকল স্থানগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, অথবা প্রতারণার মাধ্যমে পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা। ঋণ দাসশ্রম বিষয়ে একজন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞের ভাষ্য অনুযায়ী, কিছু বাংলাদেশী পরিবার ও কিছু ভারতীয় অভিবাসী শ্রমিক বাংলাদেশের ইঁটের ভাটায় দাসশ্রমের শিকার হয়। কিছু ইঁটের ভাটার মালিক ঋণে আবদ্ধ নারীদের পতিতাবৃত্তির জন্য বিক্রি করে দেয় যাতে পরিবারের নেয়া ঋণ পরিশোধ করা যায়। সেই বিশেষজ্ঞ

আরো জানিয়েছেন যে কিছু বাংলাদেশী পরিবার বাংলাদেশের দক্ষিণপূর্ব অঞ্চলে চিংড়ি চাষখাতে ঋণ দাসশ্রমের শিকার হয় এবং কিছু ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবারকে দেশের উত্তরপূর্ব অঞ্চলে চা খাতে কাজ করতে বাধ্য করা হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৮ বছর বয়সী ছেলে মেয়েরাও দেশের অভ্যন্তরে জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তির শিকার হয় যেখানে তারা ক্রীতদাসের মতো পরিস্থিতিতে নির্জন পরিবেশে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

বাংলাদেশ পাচার নির্মূল করার জন্য সর্বনিম্ন মানদন্ড পুরোপুরি মেনে চলে না। তবে, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রটি তা করার জন্য উল্লেখ্যযোগ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন ২০১২ (পিএসএইচটিএ)-এর অধীনে আরো অধিকতর সংখ্যক মামলার তদন্ত ও বিচারকাজ পরিচালনা করেছে, কিন্তু আগের বছরগুলোর মতোই অত্যন্ত কম সংখ্যক পাচারকারীকেই অভিযুক্ত করা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশের কোনো আনুষ্ঠানিক রেফারেল প্রক্রিয়া নেই এবং পাচারের যারা শিকার হয়েছে তাদেরকে সনাক্ত ও সহায়তা করার জন্য কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে পুলিশ এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদেরকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেনি। সরকার একদিকে যেমন নিয়োগকারী এজেন্টদেরকে লাইসেন্স প্রদান করতে কঠোরতর মানদন্ড আরোপ করেছে, অন্যদিকে এই সব এজেন্টদেরকে অত্যন্ত উচ্চ ও বৈধ নিয়োগ ফি গ্রহণ করা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশের জন্য সুপারিশ:

"পিএসএইচটিএ" বাস্তবায়নের নিয়মাবলী চূড়ান্ত, গ্রহণ ও বিতরণ করা এবং এর বাস্তবায়নে সরকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান। লাইসেন্সধারী শ্রমিক নিয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক প্রয়োগকৃত নিয়োগ ফি-র সিংহভাগ হ্রাস করা এবং এর ব্যত্যয় ঘটলে অপরাধী অভিযোগ প্রণয়ন করা; পাচার সংক্রান্ত মামলার বিচার করার উদ্যোগ বৃদ্ধি করা এবং পাচার সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের বিশেষ করে যারা শ্রম পাচারের অপরাধে অপরাধী তাদেরকে কঠোরভাবে সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার আওতায় বিচারের মাধ্যমে অভিযুক্ত করা; সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ করে আইন প্রণয়নকারী কর্মকর্তা, শ্রম ইন্সপেক্টর ও অভিবাসন কর্মকর্তাসহ সরকারী কর্মকর্তাদের সক্রিয়ভাবে পাচার সংক্রান্ত মামলা চিহ্নিত করার পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণের হার বৃদ্ধি করা; পাচারের শিকার বিশেষ করে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও জোরপূর্বক শ্রমের শিকারদের সহযোগিতামূলক সেবা প্রদান; জাল নিয়োগকারীদের বিচার করবার জন্য "পিএসএইচটিএ" ব্যবহার করা; সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে পাচার সংক্রান্ত দুষ্কর্মে সহায়তা করার অভিযোগ পেলে তা মোকাবিলা করার জন্য ফৌজদারী মামলা দায়ের করার মাধ্যমে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা; সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং হুমকির সম্মুখীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে দাসশ্রমের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন সম্বন্ধে সচেতনতা মূলক প্রচারণা চালানো; পাচার হয় এমন রাষ্ট্রগুলোর বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোতে আশ্রয়, আইনী সহায়তা, উপযুক্ত পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের দ্বারা সেবার মান উন্নয়ন; সম্ভাব্য অভিবাসীদের অভিবাসনের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে অভিবাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যে সহজে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি করা বিশেষ করে তাদের গন্তব্য

দেশের শ্রম আইন সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা; শ্রম অধিকার, শ্রম আইন এবং বাংলাদেশ ও গন্তব্য রাষ্ট্রগুলোতে সহায়তা ও ন্যায়বিচার পাওয়ার পন্থাসহ দেশ ত্যাগের পূর্ববর্তী প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন করা; বাংলাদেশে ও বাংলাদেশী দূতাবাসগুলোতে চিহ্নিত ও সহায়তাপ্রাপ্ত পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সংখ্যা বিষয়ক উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতির উন্নয়ন; এবং জাতিসংঘ মানবপাচার প্রটোকল ২০০০-এর প্রতি সম্মত হওয়া।

মামলা পরিচালনা

প্রতিবেদন সময়কালীন বাংলাদেশ সরকার পাচার-বিরোধী আইন প্রয়োগের প্রচেষ্টা চালানো অব্যাহত রেখেছে। ২০১২ সালের "পিএসএইচটিএ" আইন অনুযায়ী সাধারণত সকল প্রকারের মানব পাচার নিষিদ্ধ ও শাস্তির বিধান রয়েছে, যদিও এটি অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতারণামূলক নিয়োগ নিষিদ্ধ করেছে, তবে তা করা হবে তখনই যদি নিয়োগকারী অবহিত থাকে যে নিয়োগকৃত শ্রমিককে জোরপূর্বক শ্রমে বাধ্য করা হবে। শ্রমিক পাচার সংক্রান্ত আপরাধের জন্য শাস্তির বিধান আছে পাঁচ থেকে ১২ বছরের কারাবাস এবং ৬০০ ডলারের মত জরিমানা, এবং যৌন ব্যবসায় নিয়োগের উদ্দেশ্যে পাচারের অপরাধে শাস্তির বিধান রয়েছে পাঁচ বছরের কারাবাস থেকে মৃত্যুদন্ড। এই শাস্তির বিধান অন্যান্য ভয়ানক অপরাধের শাস্তি যেমন ধর্ষণ-এর শাস্তির মতই কঠোর ও সমপর্যায়ের। প্রতিবেদন চলাকালীন সময়ে সরকার "পিএসএইচটিএ"র বাস্তবায়নকারী আইনসমূহ তৈরী করা অব্যাহত রেখেছে তবে সেগুলো এখনো চূড়ান্ত করেনি।

২০১৩ সালে যৌন ব্যবসার উদ্দেশ্যে পাচারের অভিযোগে ৮৪টি নতুন মামলা এবং জোরপূর্বক শ্রমের দু'টি মামলা তদন্ত করার কথা সরকারের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০১২ সালে সরকারের প্রতিবেদনে যৌন ও জোরপূর্বক শ্রম সংক্রান্ত ৬৭টি মামলার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এই সকল মামলাই "পিএসএইচটিএ ২০১২" আইন অনুযায়ী পরিচালনা করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালে পাচার সংক্রান্ত ২১৫টি মামলার কাজ শুরু করার কথা জানায়। ২০১২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৯৪। ২০১৩ সালে সরকার ১৪ জন পাচারকারীকে অভিযুক্ত করে, আগের বছর এই সংখ্যা ছিলআট। আদালত প্রতিবেদনকালীন সময়ে পাঁচ জন পাচারকারী অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে, আট জন পাচারকারীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেছে এবং একজন পাচারকারীকে চার মাসের কারাদন্ড প্রদান করেছে।

কিছু বাংলাদেশী সরকারী কর্মকর্তা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মানব পাচারে সম্পৃক্ততার অভিযোগ মানব পাচার সমস্যাকে জটিল করেছে যা এখনো বর্তমান। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদ, পুলিশ, এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের উভয় দিকেরই সীমান্ত নিরাপত্তা হাহিনী মানব পাচারকারীদের ব্যবহৃত এমন টোকেন সনাক্ত করে যার মাধ্যমে পাচারকারীরা সীমান্তে ধরা পড়লে গ্রেপ্তার এড়াতে পারে বলেমজানা যায়। বাংলাদেশ সরকার রিপোর্ট করেছে যে মানব পাচারের সাথে সম্পৃক্ততার অভিযোগে সরকারী কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি মামলা পরিচালনার কাজ তারা অব্যাহত

রেখেছে যদিও এই মামলার তেমন কোনো অগ্রগতি হয়নি। সরকার পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমি-তে মানব পাচার বিরোধী প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা রিপোর্ট করেছে যে "পিএসএইচটিএ" সংক্রান্ত কোনো তথ্য জেলা ও স্থানীয় সরকার পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়নি।

সুরক্ষা

যারা পাচার হয়েছিলো এমন ব্যক্তিদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য বিগত বছরে বাংলাদেশ সরকার সীমিত উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০১২ সালে ৬০২টি মামলার তুলনায় পুলিশ ২০১৩ সালে পাচার হয়েছে এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সংশ্লিষ্টতা থাকা ৩৭৭টি মামলা নিবন্ধন করে। পাচারের শিকার হিসেবে সনাক্তদের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাতে সেবা কেন্দ্রের যথোপযুক্ত সন্ধান দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অভাব ছিলো এবং পাচারের শিকারদের যথোপযুক্ত সেবা সন্ধান দিতে সহায়তা করার সামর্থ্য পিএসএইচটিএ সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষের সচেতনতার ওপর নির্ভরশীল ছিলো। একটি যৌথ সাধারণ কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশী কর্মকর্তাগণ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সংগে অংশীদারিত্বে পাচার হওয়া বাংলাদেশী শিশুদের প্রত্যাবাসনের জন্য কাজ করে। মানুষ পাচারের শিকার হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে এমন ব্যক্তিদের জন্য বা তাদের আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য সরকার কোনো অর্থায়ন করেনি, তবে পাচারের শিকার হয়েছেন এমন মানুষরা সামাজিক কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্র, ড্রপ-ইন সেন্টার, এবং নিরাপদ আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্বল জনগোষ্ঠীর জন্য প্রদান করা সেবা সহায়তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রকল্পগুলো সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়ে থাকে। পাচারের শিকার প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা কোনোরকম তত্ত্বাবধান ব্যতীতই স্বেচ্ছায় আশ্রয়কেন্দ্র ত্যাগ করতে পারে। নির্যাতনকারী চাকুরিদাতাদের হাত থেকে পালিয়ে এসেছেন এমন বাংলাদেশী নারী কর্মীদের জন্য রিয়াদে বাংলাদেশী দূতাবাস এবং জেদ্দায় বাংলাদেশী কনস্যুলেটে আশ্রয়কেন্দ্রগুলো পরিচালনা করে থাকে সরকার সেটি পরিচালনা এখনো অব্যাহত রেখেছে। যে সব দেশে এই সমস্যা সবচাইতে প্রকট সে সব দেশগুলোতে শ্রম পাচারের শিকারদের পর্যাপ্ত সহায়তার জন্য বাংলাদেশের কূটনৈতিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় সম্পদের অভাব রয়েছে। বাংলাদেশের অভিবাসী শ্রমিকেরা যখন জোরপূর্বক শ্রমের অভিযোগসহ শ্রম ও নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি লংঘন বিষয়ে অভিযোগ দাখিল করে তাদেরকে বায়রার (বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিজ) সালিশ-নিষ্পত্তির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়, যার মাধ্যমে পাচার শিকার ব্যক্তিবর্গ সমস্যার সমাধান পেলেও বেশির ভাগ সময়েই আর্থিক ক্ষতিপূরণ অত্যন্ত নগণ্য হয় এবং বায়রা-অধিভুক্ত নিয়োগ এজেন্টদের বেআইনী কার্যক্রমের বিরদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। প্রতিবেদনকালীন সময়সীমায় একটি ক্ষেত্রে সরকার বেসরকারি সংস্থার সংগে কাজ করে যাতে ইরাক থেকে প্রত্যাবাসিত পাচারের শিকার ব্যক্তিদের আইনী সেবা প্রদান করা যায়। আইন প্রণয়নকারী কর্মকর্তাগণ অন্যান্য পাচারের শিকার ব্যক্তিদের নিজ পাচারকারীদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও আইনী ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত

করেছে বলে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় নি। অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা যারা পাচারের শিকার হয়েছিল উপযুক্ত কাগজপত্রের অভাবে তারা অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক থাকার ঝুঁকিতে রয়েছে।

প্রতিরোধ

২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার পাচার প্রতিরোধে কিছু সীমিত উদ্যোগ গ্রহণ করে। সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত বজায় রেখেছে যা বাংলাদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের বিদেশে জোরপূর্বক কাজ অব্যাহত রাখার অনুমতি দেয়। বিশেষ করে, সরকার বায়রাকে অনেক উচ্চ ও আইনত নিয়োগ সংক্রান্ত সম্মানী নির্ধারণের অনুমতি দেয়া অব্যাহত রাখে এবং বায়রার লাইসেন্সিং ও সনদ প্রদান চর্চার ওপর পর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করেনি যাতে বায়রার চর্চাগুলো বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের ঋণজনিত দাসত্বের সহায়ক না হয়। শ্রম পাচারের জন্য কর্তৃপক্ষ ২০১৩ সালে চারটি নিয়োগকারী সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করে যেখানে এর আগের প্রতিবেদন সময়কালে বিভিন্ন বেআইনী চর্চায় সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে ৬৫টি নিয়োগকারী সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হয়। "এক্সপ্যাট্রিয়েট ওয়েলফেয়ারস্ ভিজিলেন্স টাস্ক ফোর্স" মন্ত্রণালয় কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রেখেছে; এর কাজ বাংলাদেশের শ্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ উন্নয়ন। কিছু গমনেচ্ছু বাংলাদেশী শ্রমিকদের মালয়েশিয়াতে অভিবাসনে সরকার সহায়তা অব্যাহত রাখে। এই সহায়তা দুই দেশের সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির ভিত্তিতে কার্যকর হয় যার লক্ষ্য হলো বেসরকারি নিয়োগ সংস্থার উচ্চ সম্মানি ও মাঝে মাঝে সংস্থাগুলোর অনৈতিক কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট প্রভাবের মাত্রা হ্রাস করা যায়। সরকার ২০১৩ বৈদেশিক কর্মসংস্থান আইন প্রণয়ন করেন যার আওতায় শ্রমিক নিয়োগকারীদের নিবন্ধিত হতে হলে আরো কঠোর নিয়মকানুন মানতে হবে এবং যারা চাকুরি খুজছে তাদের একটি অনলাইন ডাটাবেইজে নিবন্ধিত হতে হবে আর চাকুরিদাতাদের কেবল সেই ডাটাবেইজে নিবন্ধিতদের মধ্য থেকে কাউকে নিয়োগ দিতে হবে। যেসব বাংলাদেশী নারীগণ গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে বিদেশে যাচ্ছে তাদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক ২১-দিনব্যাপী প্রস্থানপূর্ব প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সরকার। সরকার অন্য কোনো পাচার বিরোধী সচেতনতামূলক প্রচারণার অর্থায়ন করেনি। সরকার-বেসরকারি সংস্থা সমন্বয় কমিটি নিয়মিত বৈঠকের আয়োজন অব্যাহত রাখে, যদিও পর্যবেক্ষকদের মতে মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। সরকার ২০১২-২০১৪ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখে তবে, কিছু পর্যবেক্ষক বলেন যে কর্মপরিকল্পনায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহে সম্পদ বরাদ্দ বিষয়ে স্পষ্টতার অভাব রয়েছে এবং সমন্বয় বৈঠকে কিছু মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তাদের মন্ত্রণালয়ের ওপর প্রদত্ত দায়িত্বসমূহ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে পুরোপুরি অবগত ছিলো না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মানব পাচারের উপর বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী মিশনে নিয়োগের পূর্বে বাংলাদেশী সৈন্যদের মানব পাচার সম্পর্কে সরকার প্রশিক্ষণ প্রদান করে। সরকার বাণিজ্যিক যৌনতা সংক্রান্ত চাহিদা হ্রাসের জন্য কোনো উদ্যোগ প্রকাশ করেনি। বাংলাদেশ "২০০০ ইউএন টিআইপি প্রটোকল"-এর পার্টি নয়।